ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ ঃ বহুমাত্রিক প্রভাব

মোঃ শরীফ হাছান *

Permanent Settlement 1793 : Its Multi Dimensional Impact

Md. Sharif Hasan

Abstract : British East India Company conquered Bengal in 1757. The British Company introduced a number of reforms in the land management of Bengal for perpetuating the exploitation process. Ten years, five years and one-year settlement were introduced after one another and they failed to bring about desired result. Then, Lord Cornwallis introduced historical 'Permanent Settlement' of land in Bengal in 1793. Under this system landlords, popularly known as ' Zaminders' could raise revenue from their 'Rayats' at will. On the other hand, the 'Zaminders' had to pay affixed amount of annual revenue to the company government on a particular date before sunset. This is commonly known as 'Sunset Law'. A large proportion, around fifty percent of the 'Zaminders' were evicted from their 'Zaminderies' with the introduction of the law within the next fifty years. This system influenced the social, economic and political,lives of Bengal. The study aims to analyze the background, contemporary socio economic and political condition. It also tries to highlight both the positive and negative impacts of the system on the society, economy and politics of Bengal.

বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অভিহিত করা যায় একটি মাইলফলক হিসেবে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কারে প্রয়াসী হয়। উদ্দেশ্য দুটি হলো (১) কোম্পানীর রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং (২) বাংলায় কোম্পানীর শাসকদের অনুগত একটি সামন্ত শ্রেণী সৃষ্টি করা; যারা যে কোন সংকটের সময় শাসক শ্রেণীর অবলম্বন বা সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদাবাদের নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদানের বিনিময়ে সুবে বাংলার রাজস্ব আদায়ের

* সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি,সাভার, ঢাকা।

দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নামমাত্র নবাবের উপর। দিওয়ানী লাভের পর কোম্পানীর রাজস্ব সংকটের সুরাহা হয়। অন্যদিকে কোম্পানীর নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারে জনগণের জীবন হয়ে পড়ে অতিষ্ঠ। ইচ্ছামতো রাজস্ব আদায় চলতে থাকে। আলীবর্দী খানের সময় পূর্ণিয়া জেলায় বাৎসরিক রাজস্ব ছিলো চার লক্ষ টাকা। ১৭৬৯ সালে তা পঁচিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। দিনাজপুর জেলায় বার্ষিক রাজস্ব বার লক্ষ টাকা থেকে সতের লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এহেন অত্যাচার এবং অনাবৃষ্টি জনিত খরার কারণে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় দেখা দেয় এক মহাদুর্ভিক্ষ, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। চালের মূল্য বাড়তে বাড়তে টাকায় একমণ থেকে টাকায় তিন সেরে পৌছায়। জীবিত মানুষ কর্তৃক মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের ঘটনার বর্ণনা দেন মুর্শিদাবাদের কোম্পানীর আবাসিক প্রতিনিধি রিচার্ড বেচার। বঙ্গদেশের প্রায় অর্ধেক লোক এ মহা দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করে (ইসলাম, ১৯৮৭)। অন্যদিকে কোম্পানীর অর্থগৃধ্নুতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরও বাংলাদেশের রাজস্ব ১৭৬৮ সালের ১৫২০৪৮৫৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭১ সালে ১৫৭২৬৫৭৬ টাকায় দাঁড়ায় (উমর, ১৯৮৩)। এ দুর্ভিক্ষের পরোক্ষ ফল হলো কুখ্যাত দ্বৈত শাসনের অবসান। কোম্পানীর দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও দ্বৈত শাসন যে মন্বন্তরের জন্য দায়ী তা ফোর্ট ইউলিয়াম কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স দ্বৈত শাসন অবসান করে সরাসরি শাসনভার গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করে এক আদেশ জারী করে। সে আদেশক্রমে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ ১৭৭২ সালে দেশের প্রশাসনিক দায়িত্বভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

এহেন পরিস্থিতিতে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের উপর এমন একটি ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব অর্পিত হয় যা দেশবাসী ও কোম্পানী উভয়ের জন্য লাভজনক হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হেষ্টিংসের সামনে তিনটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। এগুলো হলো ঃ

প্রথমত, হেষ্টিংসের সামনে এদেশের ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কোন রেকর্ড ছিলো না। কারণ এ সম্পর্কে পূর্বে কোন জরীপ হয়নি;

দ্বিতীয়ত, কার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হবে? কোম্পানীর হাতে রাজস্ব আদায়ের মতো যথেষ্ট লোকবল ছিলো না। অতএব কোম্পানী কর্তৃক সরাসরি রাজস্ব আদায় না করে এজেন্টদের মাধ্যমে তা আদায় করাই যুক্তি সঙ্গত;

তৃতীয়ত, কারা হবে এ এজেন্ট? জমিদার না ইজারাদার? জমির সঙ্গে জমিদার বা জোতদারের সম্পর্ক কী হবে? (ইসলাম, ১৯৮৭)।

পাঁচ সনা, এক সনা ও দশ সনা বন্দোবস্তঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস নিজ বিচার বুদ্ধি বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন প্রয়োজন। এর পূর্বে স্বল্প মেয়াদী ভূমি ব্যবস্থার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। দেশের প্রকৃত ভূমি রাজস্ব স্থির করা ছিলো একটি বড় সমস্যা। কোম্পানী সরকার বুঝতে পারে যে জমিদার তালুকদারগণ কোন অবস্থাতেই জমির প্রকৃত মূল্য প্রকাশ করবে না। সে জন্য হেস্টিংস ১৭৭২ সালে পাঁচ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ বারে অর্থের লোভে একদল লোভী ইজারাদার নিয়োগ করা হলো, যারা সবচেয়ে বেশী খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিলো তাদের মধ্যে থেকে। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জোতদারেরা অত্যন্ত চড়া হারে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা ও আবওয়াব আদায় করতে থাকলো। কৃষকদের উপর অত্যাচার এতো চরমে উঠলো যে ১৭৮৩ সালে রংপুর ও দিনাজপুরে শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা মরীয়া হয়ে ইজারাদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (কবিরাজ ১৯৮০)। ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান রিচার্ড বারওয়েল রিপোর্ট দেন (১লা ফেব্রুয়ারী ১৭৭৫) "দেওয়ানী লাভের পর হইতে বিশেষ করিয়া ১৭৭২ সালের ইজারাদারী বন্দোবস্তের পর হইতে দেশের কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে (ইসলাম, ১৯৮৭)। পাঁচ সনা বন্দোবস্তের ফলাফল কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে জানানো হলে কোর্ট বাৎসরিক মেয়াদে জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দেয়। একটি শক্তিশালী বোর্ড অব রেভিনিউ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক জেলায় নিযুক্ত হন একজন কালেক্টর। এ বোর্ড কালেক্টরদের মাধ্যমে জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত করে। বাৎসরিক মেয়াদে সরকারী রাজস্ব দাবী যে সব জমিদার গ্রহণ করেননি তাদের জমিদারী ইজারাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়। উক্ত জমিদারগণ বাৎসরিক শতকরা ১০টাকা মালিকানা ভাতার পরিবর্তে তাদের জমিদারী ইজারাদারদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়। এর ফলে কৃষকদের উপর ইজারাদারদের শোষণ-নির্যাতন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ১৭৮৬ সালে ইংল্যান্ডের এক ভূস্বামী পরিবারের সন্তান লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর আমলেই প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তবে তিনি এর উদ্ভাবক ছিলেন না। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা সম্পর্কে কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভার নিকট

রিপোর্ট পেশ করার ফলে ডাইরেক্টর সভা বাংলায় ঘন ঘন রাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকগুলো নির্দেশ করে কর্নওয়ালিসকে প্রথমে জমিদারদের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদী এবং পরে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের নির্দেশ দেয় (রায় ১৯৮৪)। সে অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কনওয়ালিস ১৭৯০ সালে জমিদারদের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদী ভূমি বন্দোবস্ত করেন এবং ঘোষণা করেন যে ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ঃ ১৭৯২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কর্নওয়ালিস ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করলে ১৭৯৩ সালেরর ২২শে মার্চ দশ সালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষিত হয় (প্রাগুপ্ত)। এর ফলে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা পরিশোধের মাধ্যমে জমিদারগণ চিরস্থায়ীভাবে জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃত হন। জমিদারীর অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব থেকে জমিদারগণ অব্যাহতি লাভ করেন এবং এর দায়িত্ব সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করে। শত শত বছর যাবত প্রচলিত ব্যবস্থা অর্থাৎ ভূমির উপর রায়তের অধিকার এর মাধ্যমে অস্বীকৃত হলো।

উদ্দেশ্য ঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই এদেশ দখল করে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তা যতদূর সম্ভব ইংল্যান্ডে পাচার করা। এ বিষয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কোন রাখ ঢাক না করেই বলেন এ দেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব দেশে পাচার করাই ছিলো এদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের অন্যতম লক্ষ্য (ইসলাম, ১৯৯৩)। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি। কৃষির উন্নতি না করে রাজস্ব বৃদ্ধি করলে কৃষির ধ্বংস এবং কৃষক বিদ্রোহ ছিলো অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের সীমাহীন লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ব্যবসায়ও কোম্পানী বিপুল পরিমাণ লোকসান দিতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে ভূমির উপর স্থায়ী অধিকার পেলে জমিদারগণ কৃষি উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবেন। যেহেতু কোম্পানীকে প্রদেয় রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে স্থির করা হয়েছে তাই উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা জমিদারগণ লাভাবন হবেন। ফলে কৃষির উন্নয়ন হবে। দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হবে। জমিদার কর্তৃক পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রিটেনের মতো এদেশেও একটি কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হবে। তাছাড়া জমিদার সমাজ শত সুবিধার বিনিময়ে সরকারের প্রতি থাকবে অনুগত। সামাজিক শাসক হিসেবে এমনিভাবে জমিদার শ্রেণী হবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি (ইসলাম, ১৯৮৭)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আরেকটি অনুক্ত উদ্দেশ্য ছিলো। এটি হলো বাংলার কৃষি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শিল্প নির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণ ঠেকিয়ে রাখা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (আনুমানিক ১৭৬৫ খীস্টাব্দ) ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে ইউরোপে পুঁজিবাদের জয়যাত্রা সূচিত হয়। ১৬০০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পর এ কোম্পানী বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য শুরু করে। পলাশীর যুদ্ধের পর বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগী শক্তি হিসেবে একটি দেশীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এ দেশীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণী ইংরেজ বণিক কাম শাসকদের উচ্ছিষ্ট ভোগী হিসেবে ইতোমধ্যে প্রচুর অর্থ সম্পদের অধিকারী হয়। পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী এ দেশীয় পুঁজির শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশকে তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের একচেটিয়া বাজার হিসেবে ব্যবহার করে আসছিলো। এ অবস্থায় দেশীয় উদ্যোক্তা শ্রেণীর জন্মের মধ্যে তাদের একচেটিয়া ব্যবসার অনিবার্য অবসান নিহিত ছিলো। অন্যদিকে সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের সূচনা হলে পুঁজিবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে জনগণ অধিকতর অধিকার সচেতন হয়ে দেশ থেকে বিদেশী শাসন অবসানের লক্ষে বিরামহীন আন্দোলন শুরু করতে পারে। কাজেই ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের স্বাভাবিক বৈশ্য বুদ্ধিতে তাড়িত হয়ে বঙ্গদেশে শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়া অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর ফলে দেশীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণীর হাতে পুঞ্জিভূত সম্পদ শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত না হয়ে নিলামে জমিদারী ক্রয়ে বিনিয়োজিত হয় এবং বাংলায় সামন্ততন্ত্রের অবসান বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী নানা বিপদ আপদের সময় তাদের বিদেশী প্রভুদের সহযোগিতা করে বাংলায় আরো দেড় শতাধিক বছর ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখতে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (Chowdhury, 1979)। এদেশে কোম্পানী রাজত্বের শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানীর কাছে একটি লিপিতে বলেন, আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই (এ দেশের) ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অর্থ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ দমন। কৃষকদের দমনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোম্পানীর ফৌজের উপর নির্ভর না করে তারা এমন একটি শ্রেণীর সহায়তা লাভ করতে চেষ্টা করেছিলো যাদের স্বার্থের সাথে নিজেদের স্বার্থ একই গাঁটছড়ায় বাঁধা থাকবে (উমর, ১৯৮৩)।

রীতিমত রাজনৈতিক কারণে যে কোম্পানী মুঘল আমলের জমিদারদের ধ্বংস সাধন করতে চেয়েছিলো তার প্রমাণ রয়েছে। এই সময়ে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় পুরানো জমিদারেরা ইংরেজ শাসন পত্তনের বিরোধিতা করেন এবং তারা অনেক সময় স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতেন। তাই ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত জমিদারদের সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেও পুরনো জমিদারদের কোম্পানীর প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে গভীরভাবে সন্দিহান ছিলেন। তাই তিনি একটি বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, "বড় বড় জমিদারেরা তাঁদের প্রচন্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাঁদের প্রভাব নষ্ট করা একটি বাঞ্চনীয় কাজ (কবিরাজ ১৯৮০)। সুতরাং এদেশে কোম্পানীর আধিপত্য নিষ্কন্টক ও দীর্ঘস্থায়ী করার স্বার্থে এসব বিপজ্জনক জমিদারদের উৎখাত করে তাদের স্থলে একদল রাজানুগত জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নব সৃষ্ট জমিদারদের সবারই একটি বিষয়ে মিল ছিলো আর তা হলো ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য। নব সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর পারিবারিক ইতিহাস থেকেই ব্রিটিশ শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাশিমবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান। হেস্টিংসের আশীর্বাদে নাটোরের রাজার জমিদারীর কিয়দংশ আত্মসাৎ করে তিনি বিরাট জমিদারে পরিণত হন। হেস্টিংসের মুন্সী নবকিষণ প্রভুর কৃপায় প্রতিষ্ঠা করেন শোভাবাজার রাজ পরিবার (প্রাগুপ্ত)। বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার কোম্পানীর দেওয়ানী করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। এঁর পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে প্রচুর ধন সঞ্চয় করে পৃথকভাবে বাণিজ্য শুরু করেন। এসব বাণিজ্যের মধ্যে নীল ও রেশম রফতানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কোম্পানীর নাম ছিলো টেগোর এ্যান্ড কোঃ, তিনি ইউনিয়ন ব্যাংক এর প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে তিনিই ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাংকের একমাত্র মালিক। এ থেকেই তাঁর সম্পদের পরিমাণ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারীর প্রায় সর্বত্রই নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন (আখতার ১৯৮৭)।

বৈশিষ্ট্য ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতিমালায় উল্লেখ ছিলো-

খরা, বন্যা বা মহামারী কোন অবস্থাতেই জমিদারের দেয় রাজস্ব কমানো বা মওকুফ করা যাবে না। জমিদার তার দেয় রাজস্ব সময় মতো না দিতে পারলে

আংশিক বা পুরো জমিদারী বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে। (ধারা ৬, উপধারা ৭, রেগুলেশন নং১, ১৭৯৩)

কোন জমিদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবে না বা প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। দৈহিক নির্যাতন করতে পারবে না। জমিদারের অভিযোগ থাকলে সে যেন দেওয়ানী আদালতে মামলা রুজু করে। জমিদার বা তালুকদার যদি এ আদেশ অমান্য করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রজা অভিযোগ করে তবে দোষী সাব্যস্ত হলে জমিদারকে প্রজার মামলার খরচ বহন করতে হবে। (ধারা ৩, ৪, ৫, ২৮ রেগুলেশন নং ৭, ১৭, ১৭৯৩)

ন্যায্য খাজনা ছাড়া কোন প্রকার কর বা আয়কর আদায় চলবে না। এখন থেকে জমিদারকে প্রজাদের পাট্টা দান করতে হবে উক্ত পাট্টায় পরিস্কারভাবে খাজনার পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে। প্রজাদের উপর শোষণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে জমিদারকে বে আইন অর্থ আদায়ের তিনগুণ দিতে হবে। (ধারা ৫ ঃ রেগুলেশন ৮ ও ধারা ৫৭ উপধারা১, রেগুলশেন নং৮, ১৭৯৩)।

জমিদারদের অধীনস্থ তালুকদারদের এখন থেকে আলাদা করে গণ্য করা হবে এবং তাদের সাথে আলাদাভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে। (ধারা ৫, রেগুলেশন ৮, ১৭৯৩০ (হক ১৯৮৪)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে কাগজে কলমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের পক্ষে অনেকটা অনুকূল ছিলো, যদিও বাস্তবে কৃষকেরা এসব আইনের সুফল পায়নি বললেই চলে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিলো 'সূর্যাস্ত আইন'। এ আইন অনুযায়ী জমিদারগণকে একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে সরকারকে দেয় খাজনা পরিশোধ করতে হতো। এর কোনরূপ অন্যথা হলে জমিদারের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হতো। এ বিষয়ে সরকার কখনোই কোন ধরণের ছাড় দিতেন না। ফলে প্রথমদিকে নিয়মকানুন সম্বন্ধে অজ্ঞ জমিদারগণ এ আইনের মাধ্যমে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

মুঘল যুগের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্ব ভোগীর কোন স্থান ছিলো না। কারণ সে ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার প্রত্যেক গ্রামে মাতব্বরদের সহায়তায় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী পর্যায়ের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী ছাড়াও ধাপে ধাপে আরও অনেক ধরণের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জন্ম। এই মধ্যস্বত্ব

ভোগীরা মূল জমিদারদের পক্ষ থেকে জমিদারী দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত হতো এবং জমিদারদের দেয় রাজস্ব ও জমিদারদের থেকে তাদের পাওনা বাদ দিয়ে অতিরিক্ত আদায় দ্বারা নিজেদের উদরপূর্তি করতো (উমর, ১৯৮৩)।

উইলিয়াম হান্টারের অনুসরণে অনেকে মনে করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদার সব ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের স্থান দখল করে হিন্দু পুঁজিপতিগণ। ঐতিহাসিকভাবে এধারণা অযৌক্তিক। মুঘল আমল থেকে ভূমি প্রশাসনে হিন্দুদের ছিলো একচেটিয়া আধিপত্য আর মুসলমানদের ছিলো বিচার বিভাগে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে ছয়টি বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে একমাত্র বীরভূমের রাজা ছিলেন মুসলমান। বাকী সবাই হিন্দু। ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যেও বেশীর ভাগ ছিলেন হিন্দু যে যৎসামান্য জমিদার ছিলেন মুসলমান তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র জমিদারগণ সূর্যাস্ত আইনে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হন (ইসলাম, ১৯৮৭)। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু এবং মুসলমানদের পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে, তাদরে মধ্যে বিবাদ, বিসংবাদ জীইয়ে রেখে এদেশে ব্রিটিশ শাসন নির্বিঘ্ন এবং দীর্ঘস্থায়ী করাই ছিলো এহেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচারের মূল কারণ। উইলিয়াম হান্টার তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ Indian Mussalmans-এ মন্তব্য করেছেন, একশত বছর পূর্বে এদেশে কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া ছিলো অসম্ভব। অথচ বর্তমানে কোন মুসলমানের পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব (Hunter, 1982)। এটা যে অতিশায়াক্তি তা বুঝতে কষ্ট হয় না কারণ এদেশে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ সব সময়ই ছিলো অত্যাচারিত। শুধুমাত্র স্বধর্মী হওয়ার কারণে কোন প্রজা রাজা বা জমিদারের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। হান্টার সাহেবই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে 'দৃষ্কৃতকারী' আখ্যায়িত করেছেন (প্রাগুপ্ত)। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হান্টার সাহেবের এহেন সহানুভূতি যে কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছু নয় বরং এটা যে ব্রিটিশ শাসকদের Divide and Rule নীতির মাধ্যমে এদেশবাসীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার পরিকল্পনার অংশ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ফলাফল ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ছিলো বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিকই ছিলো। এ ব্যবস্থার পক্ষে রামমোহন রায় বলেন; এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমির উন্নতির দিকে জমিদারদের নজর পড়েছে বহু পতিত জমি জমিদারদের উদ্যোগে কর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। জমির মূল্য বহুগুণ বেড়েছে। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে

তিনি বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের যে একতরফা সুবিধা দেয়া হয়েছে, তাতেই কৃষকের দুর্দশা বেড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকের উপর খাজনার ভার লাঘব করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত (কবিরাজ ১৯৮০)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিবার্য ফল হলো বাংলার কৃষক সমাজের সর্বনাশ। এ ব্যবস্থার ফলে কৃষক (রায়ত) জমিতে তার স্বত্ব হারায়। মুঘল যুগে স্থায়ী রায়তদের জমিতে স্থায়ী অধিকার ছিলো। জমিদারের পক্ষে খাজনা বৃদ্ধি করা বা রায়তকে জমি থেকে উৎখাত করা ছিলো অসম্ভব। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়ত পরিণত হয় জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায়। জমি পরিণত হয় জমিদারের সম্পত্তিতে। জমিদার ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি এবং রায়তকে জমি থেকে উৎখাত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বাংলায় জমিদারদের কাছ থেকে সরকার খাজনা পেতো একর প্রতি দশ আনা আট পয়সা হারে অথচ জমিদারগণ বে আইনী আদায় বাদ দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো একর প্রতি তিন টাকা হারে অর্থাৎ সরকারকে যা দিতো তার পাঁচগুণ। ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে জমিদারগণ ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি করতে থাকে। অপদার্থ জমিদারগণ নিজেদের জমিদারীর কার্য সম্পাদনে অক্ষম হওয়ায় নিয়োগ করে একদল মধ্যস্বত্ব ভোগী। প্রজাদের উপর নির্যাতনে এরা জমিদারদের ছাড়িয়ে যায়। সমস্ত উনিশ শতক এবং বিশ শতকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসে এই অতিরিক্ত মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা উত্তরোত্তরভাবে বৃদ্ধি লাভ করে এদেশে নিয়মিতভাবে খাদ্য সংকট, মহামারী, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে এবং কৃষকদের জমি থেকে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে উচ্ছেদ করে তাদের পরিণত করেছে ভূমিহীণ কৃষক ও গ্রাম্য দিন মজুর শ্রেণীতে (উমর, ১৯৮২)। মীর মোশারফ হোসেন 'জমিদার দর্পণ' নাটকে বলেছেন, আচ্ছা মফস্বলে এক রকমের জানোয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ জানে যে এ জানোয়ার বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয়না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি জানোয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে বাঘ হয়ে বাস করে। এই জানোয়ারেরা আবার দুই দল, যেমন হিন্দু আর মুসলমান (কবিরাজ ১৯৮০)। জমিদারদের একটা বিরাট অংশ বসত করে মহানগর কলকাতায়। কৃষকের রক্ত জল করা অর্থে এরা মত্ত হয় সীমাহীন বিলাস ব্যসনে। দেশের অধিকাংশ জনগণ যখন

জমিদারের খাজনা পরিশোধের অর্থ যোগাতে প্রাণপাত করছে এবং দারিদ্রের পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন এ পরজীবী শ্রেণী ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা ওড়ানো, বিড়ালের বিয়ে ইত্যাদি তুচ্ছ কাজে খরচ করতে থাকে লক্ষ লক্ষ টাকা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তিন কোটি টাকা খরচ করে বিলাত ভ্রমণ করেছিলেন (সুনীল, ১৯৮৮)। এ অর্থ যে দরিদ্র, নিরন্ন প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিলো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নবসৃষ্ট এ জমিদার শ্রেণী সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাট বংকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশের এখনকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতির মধ্যে কাটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি বড় আঁট, কতকগুলি কেবল ভুতুড়ি সার, গরুর খাদ্য (কবিরাজ ১৯৮০)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুরুতে বঙ্গদেশের ভূমি ব্যবস্থায় দেখা দেয় বিরাট সংকট। সূর্যাস্ত আইনের প্রয়োগের ফলে বড় বড় জমিদারীগুলি দ্রুত নিলামে বিক্রি হতে থাকে। নাটোর, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদারী প্রথম দশ বছরের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একমাত্র বর্ধমানের জমিদার দ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পান। ১৮২০ সাল নাগাদ বাংলার প্রায় অর্ধেক জমিদারী ভূমি নিলামের মাধ্যমে হাত বদল হয় (ইসলাম, ১৯৯৩)। হাত বদলের মাধ্যমে জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ায় জমিদার শ্রেণীতে এলো রূপান্তর। পূর্বের রাজা, মহারাজা উপাধিধারী জমিদারদের স্থালাভিষিক্ত হলো নতুন এক শ্রেণী যারা আগে ছিলেন ব্যবসায়ী, সরকারী ও জমিদারির কর্মচারী। এরা প্রধানত সামাজিক মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যেই ভূমি নিয়ন্ত্রণে যোগদান করেন। প্রজা পীড়নে পূর্বসুরিদের তুলনায় এরা ছিলেন অধিকতর নিষ্ঠুর। তাদের স্থায়ী ঠিকানা ছিলো শহরে। আর তাদের এস্টেট পরিচালনা করতেন নায়েব গোমস্তারা, গ্রামীন সম্পদ পাচার হয়েছে শহরে,বেড়েছে গ্রামীন দারিদ্র (প্রাগুপ্ত)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবশ্যাম্ভাবী ফলাফল হলো অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ। নবসৃষ্ট জমিদার এবং তাদের আমলা, গোমস্তাদের শোষণ-নির্যাতনের শিকার কৃষক-জনতা তাদের ক্ষোভের সরব প্রকাশ ঘটিয়েছে বিদ্রোহের মাধ্যমে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একদিকে যেমন এই জমিদার শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিলো অপরদিকে তেমনি তা জন্ম দিয়েছিলো অসংখ্য কৃষক সংগ্রামের, যে সব সংগ্রামের মূল চরিত্র ছিলো গণতান্ত্রিক (উমর ১৯৮২)। কোন এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে প্রথমে জমিদার তা দমনের চেষ্টা করতেন। জমিদার ব্যর্থ হলে পুলিশ বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী ব্যর্থ হলে সেনাবাহিনী তলব করা হতো। এ সময়ে সংঘটিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হলা তিতুমীরের বিদ্রোহ, মজনু শাহের নেতৃত্বে

ফকির বিদ্রোহ, ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নূরল দীনের নেতৃত্বে রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, সন্দ্বীপ বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, বলাকী শাহের বিদ্রোহ ইত্যাদি। মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক সমসাময়িক ছিলেন। এক পর্যায়ে উভয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেন (ইলিয়াস, ১৯৯৮)। বিদ্রোহগুলোর মধ্যে কোন কোনটি ছিলো জমিদারদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত স্থানীয় প্রতিবাদ।

এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী এবং নিষ্কন্টক করার বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসেবে শাসক শ্রেণী পেয়েছিলো জমিদার শ্রেণীকে। বিশেষ করে কৃষক বিদ্রোহ দমনে জমিদার শ্রেণী উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের কাজের ভার অনেকটা লাঘব করে দেয়। এ সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮২৯ সালে ঘোষণা করেন, আমি এটা বলতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণ বিক্ষোভ অথবা গণ বিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রসু হয়েছে। অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে, এমনকি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও এর ফল এমন এক বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যারা ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল এবং জনগণের ওপর যাদের অখন্ড প্রভুত্ব বজায় আছে (উদ্ধৃত উমর ১৯৮২)। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শুরু হলে এ শ্রেণী তাদের বিদেশী প্রভুদের দান করে সর্বাত্মক সহযোগিতা। এ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশের জয়লাভে জমিদারদের সহযোগিতা পালন করে নির্ধারক ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশের বংশবদ এ লাঠিয়াল শ্রেনীর (কিছু ব্যাতিক্রম বাদে) অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই ১৮৫৭ সালের মহাপ্রলয় থেকে এ দেশের ব্রিটিশ শাসন রক্ষা পায়। এ মহান সংগ্রামে ঢাকার নবাব আবদুল গণি, ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যশোরের বরদাকান্ত রায়, চট্টগ্রামের কালিন্দী রাণী, রংপুরের রাণী স্বর্ণময়ী দেবী, পাবনার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, নোয়াখালীর যশোদাকুমার পাইন, সৈয়দ আমীর আলী, গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়, খোদা বক্স শাহ, খেদমত শাহ ফকির ও ইয়াসিন শাহ ফকির অকুণ্ঠ চিত্তে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের বিদেশী প্রভুদের এ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে সহায়তা করেন। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত জমিদারগণসহ বাংলার অধিকাংশ জমিদার ব্রিটিশ প্রভুদের সহযোগিতার বিষয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২৬শে মে রাজা রাধাকান্তদেব এর সভাপতিত্বে কলকাতা হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় বিদ্রোহীদের কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা এবং ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি সর্বাত্মক

সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় শুরু হয় ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন যা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কেঁপে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও জমিদার শ্রেণী তাদের প্রভুদের দান করে সহযোগিতা। কোন কোন জমিদার বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিতে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ বিষয়ে বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো বলেন, এ কাজে সরকারী ছোট বড় কর্মচারীদের মধ্যে এমনকি পুলিশের কাছেও বরং সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে কম সাড়া পেয়েছি (উদ্বৃত উমর ১৯৮২)। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু হলে বঙ্গীয় জমিদার সংঘের সভাপতি গভর্ণর জেনারেলের উদ্দেশে বলেন মহামান্য বড় লাট বাহাদুর! আপনি জমিদার দিগের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন (প্রাগুপ্ত)। এ অঙ্গীকার উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করা হয়েছিলো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি রাজস্ব খাতে সরকারের আয় চিরদিনের মতো নির্দিষ্ট হয়ে যায় অন্যদিকে জমিদারগণ সময় সময় রাজস্ব বৃদ্ধি করে নিজেদের আয় বাড়িয়ে চলছিলো। ১৮৮০ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে সে বছর ভূমি রাজস্ব থেকে বাংলার জমিদারের আয় করেছিলো দুকোটি পাউন্ড অন্যদিকে সরকারী কোষাগারে জমা পড়ে মাত্র চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড (প্রাগুপ্ত)। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বঙ্গদেশের কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা নয়। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সমপরিমাণ জমিতে অধিক ফসল ফলানো এবং উদ্বৃত্ত ফসল লাভজনকভাবে বাজারজাত করার ব্যবস্থাকে বলা হয় কৃষির উন্নয়ন। অন্যদিকে কৃষি কৌশলের উন্নয়ন না ঘটিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন করাকে বলা হয় কৃষি সম্প্রসারণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রকৃতপক্ষে এদেশে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিলো। এর ফলে দেশ দীর্ঘদিন দুর্ভিক্ষমুক্ত থেকেছে। তবে এ কৃতিত্ব কৃষক সমাজের, জমিদারদের নয়। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক জেমস মিল এর ভাষায় রায়তের হাতে পুঁজি সৃষ্টিতে জমিদারি ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছে এমন ধারণা আমি করতে পারি না। আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে, অধুনা যে কৃষির সম্প্রসালন ঘটেছে এর জন্য দায়ী কৃষক, জমিদার নয় (উদ্বৃত ইসলাম ১৯৯৩)। তৎকালীন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য হেনরি নিউনহ্যাম বলেন বাংলায় কৃষি সম্প্রসারন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে কৃষক শ্রমিক কর্তৃক। জমিদারের ভূমিকা এখানে শুধু কৃষককে

উচ্চহারে চক্রবৃদ্ধি সুদে সামান্য ঋণ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জঙ্গল পরিষ্কার করে জনপদ সৃষ্টি করা, পুকুর কাটা, জলাশয় নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেছে কৃষক-শ্রমিক (প্রাগুপ্ত)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে সংঘটিত ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণের সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবীদার কৃষক সমাজ, জমিদার শ্রেণী নয়।

১৭৬৫ সালে প্রধানত ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র করে সূচিত শিল্প বিপ্লবের প্রভাব থেকে বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন রাখা অর্থাৎ শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ করে বাংলার শিল্প খাতকে স্থবির রেখে এখানে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার অক্ষুন্ন রাখতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ব্রিটিশ সরকার দেশীয় শিল্প থেকে প্রাপ্ত মুনাফার উপর আয়কর ধার্য করে কিন্তু জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয় ছিলো করমুক্ত। এমতবস্থায় বাংলার ধনিক শ্রেণী তাদের হাতে সঞ্চিত বিনিয়োগযোগ্য অর্থ শিল্প স্থাপনে ব্যয় না করে জমিদারী ক্রয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যয় করে। কারণ জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয় ভোগ করা যেতো নিরুপদ্রবে এবং এ খাতে মুনাফাও ছিলো শিল্প স্থাপনের চেয়ে বেশী। উপরন্তু শিল্প স্থাপনে অনেক সময়ই লোকসানের ঝুঁকি থেকে যায়। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্যোক্তা শ্রেণীর উদ্ভবের স্বল্পতা সম্পর্কে গবেষক বিনয় ঘোষ সমসাময়িক পত্রে বাঙ্গালার সমাজচিত্র পুস্তকে লিখেছেন, এই নতুন ধনিক শ্রেণীর কাছে জমিদারী ও বাণিজ্য পণ্যের মতো লেনদেনের স্পেকুলেশন ও মুনাফার বস্তু হয়ে উঠল। বস্তুত কর্ণওয়ালিসেরও উদ্দেশ্য ছিলো তাই। এ দেশের নতুন ধনিক শ্রেণীর সঞ্চিত ধনের একটা গতি করা প্রয়োজন। জমিদারীতে নিরাপদ আয় এবং অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে কর্ণওয়ালিস এ দেশের নতুন বাণিজ্য লব্ধ মূলধনকে স্বাধীন শিল্পায়নের ক্ষেত্র থেকে সনাতন ভূসম্পত্তির দিকে পরিচালিত করেছিলেন (উমর ১৯৮৩)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী শুধুমাত্র কৃষক শোষণ, নজীরবিহীন অনাচার এবং বিদেশী প্রভুদের সেবাদাস বৃত্তির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। তাদের ইতিবাচক কর্মকান্ডের ফিরিস্তিও কম লম্বা নয়। এদেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তারা একটি শক্তিশালী বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি রচনায় ইতিবাচক অবদান রাখেন। বাংলার অসংখ্য স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনেক জমিদার অর্থ, জমি ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন।

এদেশের বর্তমানে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা বড় অংশের প্রতিষ্ঠাতা

প্রকৃতপক্ষে জমিদারগণই। ঢাকাবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ পালন করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রজা অন্তঃপ্রাণ। তিনি প্রজা সাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য গোল আলুর চাষ, আধুনিক কৃষি উপকণের ব্যবহার এবং উন্নত জাতের গবাদিপশু পালনে প্রজাদের উৎসাহিত করেন। তিনি নোবেল পুরস্কার লব্ধ অর্থের কিয়দংশ চাষীদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এদেশে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টার পথিকৃৎ। বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সিল্কের প্রচার ও প্রসারে তিনি পালন করেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা (সুনীল ১৯৯৬)। প্রজা সাধারণের সুবিধার জন্য অনেক জমিদার খনন করেন অসংখ্য পুকুর, দীঘি, খাল এবং নির্মাণ করেন অজস্র মসজিদ, মন্দিরসহ নানা ধরণের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দিকে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনকারীদের রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করে। ফলে উপাধি লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক জমিদার স্কুল কলেজ স্থাপন করেন। ১৯২০ সনের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে দেশের সব কয়টি স্কুল কলেজের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত (ইসলাম ১৯৮৭)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয় তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নবোত্থিত জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে কলকাতা শহরে। এদের একাংশ কালক্রমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুক্তবুদ্ধি চর্চায় নিয়োজিত হয় ও এতে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার দমনে সরকারী প্রচেষ্টায় এরা সমর্থন দান করে। শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে স্থাপিত হয় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোতে জমিদারদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলো। ১৮১৫ সালে বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ, সতীদাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় স্থাপন করেন আত্মীয় সভা। গোপীমোহন ঠাকুর, তৎপুত্র প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, তেলেনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, টাকীর কালীনারায়ণ রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ জমিদার এর সঙ্গে যুক্ত চিলেন। ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যানুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জনার্থে কলকাতায়

স্থাপিত হয় গৌড়ীয় সমাজ। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, বৈদ্যনাথ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ভূস্বামী। ১৮৩৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে মুক্তবুদ্ধি চর্চার লক্ষ্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের অভ্যুদয় হয় এ পত্রিকার মাধ্যমে (আখতার ১৯৮৭০। ভারতে প্রথম আধুনিক পুরুষ রাজা রামমোহন রায় তার যুগান্তকারী একেশ্বরবাদী মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্ম মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বেশ কয়েকজন জমিদার এবং মুক্ত বুদ্ধির সমর্থক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

অন্যদিকে রাজা রামমোহনের মতবাদের বিরোধিতা করে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল অংশের পক্ষ থেকেও শুরু হয় রামমোহন বিরোধী বিরামহীণ অপ্রচার। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসার রোধ করার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি।

বাংলার রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে শেরে বাংলা ফজলুল হক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশের রাজনীতির মূল নিয়ন্ত ছিলো জমিদার শ্রেণীই। ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। শুরু থেকেই বাংলার জমিদার শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। এক সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন একেক বছর বাংলার একেক স্থানে অনুষ্ঠিত হতো এবং আয়োজক হিসেবে থাকতেন স্থানীয় জমিদার। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। প্রথমদিকে মুসলিম লীগকে বলা হতো নবাব-নাইটদের পকেট সংগঠন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে জমিদার শ্রেনীর একাংশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনেক জমিদার তাদের জমিদারীতে বিলাতি পণ্য বিক্রয় বন্ধ করে দেন। ১৯০৬ সালের বেঙ্গল পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে মহারাজ সূর্যকান্ত ১০ হাজার টাকা, মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী ৫ হাজার টাকা, মহারাজ টি পালিত ৫ হাজার টাকা, মহারাজ জানকী রায় ৫ হাজার টাকা, গজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫ হাজার টাকা, সন্তোষ ব্রাদার্স ৩ হাজার টাকা, দিঘাপাতিয়ার মহারাজ ২.৫ হাজার টাকা, সোবহান

চৌধুরী ১ হাজার টাকা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১ হাজার টাকা এবং নাটোরের মহারাজ ১ হাজার টাকা চাঁদা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন (আখতার, ১৯৮৭)। নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে এর সপক্ষে প্রচারণা চালান। বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের বিনিময়ে নবাব সলিমুল্লাহর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে প্রধানত বাঙারী হিন্দু যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র পন্থায় এদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ অগ্নিযুগের বিপ্লবী হিসেবে খ্যাত। ব্রিটিশ বিরোধী এ সশস্ত্র আন্দোলনে জমিদার পরিবারের অনেক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। হুগলীর জমিদার পরিবারের সন্তান নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। পুলিশের হাতে ধৃত হওয়ার পর তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় সহযোগী বিপ্রবী কানাই লাল ও সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নরেন্দ্রনাথকে কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করেন। বিচারে উভয় বিপ্লবীর ফাঁসি হয় (ওয়ালিউল্লাহ ১৯৬৯)। জনশ্রুতি আছে যে ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী এবং গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সশস্ত্র বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করতেন (আখতার ১৯৮৭)।

মুঘল আমল থেকেই বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট অধিকাংশ জমিদারও ছিলেন হিন্দু। কিছু সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদ দিলে চরিত্রগতভাবে অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন অত্যাচারী। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এ পরিস্থিতিকে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অত্যাচার হিসেবে চিত্রিত করে প্রচারণা চালায় এবং এতে সফলও হয়। অথচ চরিত্রগত দিক দিয়ে হিন্দু এবং মুসলমান জমিদারদের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিলো না। জমিদারগণ ধর্মীয় কারণে নয় বরং শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করতেই প্রজাপীড়ণ চালিয়েছে। হিন্দু জমিদারের অত্যাচার থেকে হিন্দু প্রজা এবং মুসলমান জমিদারের অত্যাচার থেকে মুসলমান প্রজা ধর্মীয় কারণে রেহাই পেয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের অন্যতম কারণ ছিলো জমিদার শ্রেণীর প্রজাপীড়ণ এবং তার উদ্দেশ্যমূলক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা।

উপসংহার ঃ ১৯৫১ সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক জারীকৃত এক আইন বলে তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে দেড় শতাধিক বছর যাবত চলমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। উক্ত আইনে

চা বাগানসহ বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত কোন পরিবারের দখলে সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা জমি রাখার আইন জারী করা হয়। ফলে বঙ্গদেশের কৃষক জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে তাদের অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। বেনামে নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক বেশী জমি দখলে রাখা জোতদার শ্রেণী কৃষকদের উপর জেঁকে বসলো। শোষণ নির্যাতনে অনুপস্থিত জমিদারদের তুলনায় এরা ছিলো অধিকতর নৃশংস। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে এক নামে ভোগদখলযোগ্য জমির সর্বোচ্চ সীমা ৬০ বিঘা। এতোসব পরিবর্তনের পরও বাংলাদেশের কৃষক শ্রেণীর অবস্থার যে বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতিকে আমূল প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রকারেই ছিলো। জমিদারদের শোষণ-নির্যাতনে কৃষক সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অনেক কৃষক এর ফলে পরিণত হয় ভূমিহীণ ক্ষেত মজুর এমনকি দস্যুতে। কৃষক বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিলো জমিদারী অত্যাচার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় সামন্ততান্ত্রিক যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পুঁজিবাদের বিকাশ বিলম্বিত হয়। এ সবই ঐতিহাসিকভাবে সত্য। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাংলায় ধীরে ধীরে বিকশিত হতে শুরু করে একটি শিক্ষিত, সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ শ্রেণীর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রধানত জমিদাগরণ কর্তৃক স্থাপিত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে এদেশে সূচনা করে ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের। এ দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কার্ল মার্কসের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ দেশে এক নীরব সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলো (উমর ১৯৮৬)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলায় কৃষক সমাজের প্রতিভু হিসেবে হাশিম শেখ ও রামা কৈবর্তের ভাগ্যের পরিরবর্তন না ঘটায় আক্ষেপ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসন এখন এদেশে আর নেই। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে অর্ধ শতাব্দী আগে। সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত অলীক রাষ্ট্র পাকিস্তানী কাঠামো ভেঙ্গে রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু এখনো বংকিম কথিত সেই হাশিম শেখ ও রামা কৈবর্তদের দুর্ভাগ্যের রজনীর হয়নি অবসান। বাঙালী হিসেবে এটা আমাদের জাতীয় লজ্জা। তবে রাতারাতি এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন ভূমি আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্টন এবং জনঘনিষ্ঠ, বাস্তবভিত্তিক ও দূরদৃষ্টিপ্রসূত সরকারী নীতিমালা ও তার বাস্তবায়ন।

তথ্য নির্দেশিকা

ইলিয়াস. আথতারুজ্জামান (১৯৯৮) ***খোয়াবনামা,*** ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) ১৯৯৩ ***বাংলাদেশের ইতিহাস,*** ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম, সিরাজুল (১৯৮৬) ***আঠারো-উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র।***

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৭) ***চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক,*** কলকাতা ঃ চিরায়ত প্রকাশন।

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৬৯) ***আমাদের মুক্তি সংগ্রাম,*** ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

কবিরাজ, নরহরি (১৯৮০) ***স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা,*** ঢাকা ঃ বাণী প্রকাশ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯০) ***সেই সময়,*** কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর রহিম, এবিএ মাহ্‌মুদ এ এম চৌধুরী (১৯৮৭) ***বাংলাদেশের ইতিহাস,*** ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

রায়, অতুলচন্দ্র (১৯৮০) ***ভারতের ইতিহাস*** (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা ঃ মৌলিক লাইব্রেরী।

হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ (অনুবাদ এম আনিসুজ্জামান, নতুন সংস্করণ ১৯৮২) **দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস,** ঢাকা ঃ খোশরোজ কিতাবমহল।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র (বাংলা ১৩৮১) ***বাংলাদেশের ইতিহাস আধুনিক যুগ,*** কলিকাতা ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড।

হক, মেসবাহুল (১৯৮৪) ***পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ,*** ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

মুকুল, এম আর আখতার (১৯৮৭) ***কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি,*** ঢাকা ঃ সাগর পাবলিশার্স।

Chowdhury. Lutful Hoq (1979) ***Social Change and Development Administration,*** **Dhaka** : NIPA.